৩.৩.৬ খোলা কূটনীতি নিয়ে মর্গেনথোর মত

বিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিদ হানস জে. মার্গেনথো (Hans J. Morgenthau) তাঁর Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace গ্রন্থে লিখেছেন যে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর কূটনীতির অবক্ষয় হয়েছে। এই অবক্ষয়কে তিনি 'কূটনীতির পতন' বা The Decline of Diplomacy বলেছেন। তিনি লিখেছেন যে আজকাল কূটনীতি সেই উদ্দীপিত, উজ্জ্বল এবং সারাক্ষণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে না যা সে করত তিরিশ বছরের যুদ্ধের শেষ থেকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সূচনা পর্যন্ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শেষ হওয়ার সাথে সাথেই কূটনীতির পতন হতে শুরু করে। ("Today diplomacy no longer performs the role, often spectacular and briliant and always important, that it performed from the end of the Thirty Year 's W ar to the beginning of the First W orld W ar. The decline of diplomacy set in with the end of the First W orld W ar"—Morgenthau) । দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে কূটনীতি এমনভাবে তার শক্তি হারিয়েছিল যা আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে বিরল ("Since the end of the Second W orld W ar, diploacy has lost its vitality, and its functions have withered away to such an extent as is without precedent in the history of the modern state system"—Morgenthau)। এই অবক্ষয়ের পেছনে বেশ কয়েকটি কারণ আছে বলে তিনি মনে করেন। একটি কারণ হল যোগাযোগ ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি যার ফলে কোন কূটনীতিবিদকে কূটনৈতিক কার্যাবলীর জন্য ছলা-কলা, নিঃসীম গোপনীয়তা এবং পরভূমে অরক্ষিত থাকার নিশ্চয়তা ইত্যাদির দ্বারা আক্রান্ত হতে হয় না। তিনি নিমেষে টেলিফোনের মাধ্যমে স্বদেশের সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন, প্রয়োজনে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উড়ে যেতে পারেন নিজের দেশে। এই যোগাযোগ ব্যবস্থার বৈপ্লবিক উন্নতিতে কূটনীতিবিদদের মানসিকতা ও কার্যাবলীর পরিবর্তন হয়েছে। এর সঙ্গে পরিবর্তন হয়েছে দেশে দেশে মানুষের মানসিকতা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পর্যন্ত কূটনৈতিক টেকনিকের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার ছিল তার গোপনীয়তা। বিশ্বযুদ্ধের পর মানুষ বুঝতে পেরেছে যে এই গোপনীয়তাই বিশ্বশান্তির সবচেয়ে বড় শত্রু। মর্গেনথো (Morgenthau) বলেছেন যে কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সক্ষমতা প্রথমে এই বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলেছিল যে কূটনৈতিক কার্যাবলীকে বাদ দেওয়া যায়। তারপরে এই ধারণা যুক্ত হল যে কূটনৈতিক কার্যাবলীকে বাদ দেওয়া উচিত কারণ তা কখনোই শান্তির স্বার্থে প্রযুক্ত হয় না, তা শুধু শান্তিকে বিপন্ন করে তোলে মাত্র ("To the technological ability to part with because they not only contribute nothing to the cause of peace, but actually endanger it".— Morgenthau) এই বিশ্বাস সেই পরিবেশের জন্ম নিয়েছিল যে পরিবেশে আত্মপ্রকাশ করেছিল এই বোধে যে ক্ষমতার রাজনীতি ইতিহাসের দুর্ঘটনা থাকে মনোবলের দ্বারা অপসারিত করতে হবে ("This conviction grew in the same soil that nourished the conception of power politics as an accident of history to be eliminated at will"—Morgenthau)।

এই বোধই কূটনীতির অবক্ষয়ের সবচেয়ে বড় কারণ। আর এই বোধের সবচেয়ে বড় প্রকাশ হল উড্রো উইলসনের (Woodrow W ilson) চতুর্দর্শ শর্তের (Fourteen Points) প্রারম্ভিক ঘোষণা (Preamble) ঃ "এটাই হবে আমাদের ইচ্ছা আর উদ্দেশ্য যে শান্তির প্রক্রিয়া যখন শুরু হবে তখন তা হবে চূড়ান্তভাবে খোলা এবং এর পর থেকে এই প্রক্রিয়ায় আর কোন গোপন বোঝাপড়া স্থান পাবে না ("It will be our wish and purpose that the processes of peace, when they are began, shall be absolutely open, and that they shall involve and permit henceforth no secret understandings of any kind"—Morgenthau)। এইরকম একটি সার্বিক ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছিল খোলা কূটনীতির মুক্ত অঙ্গীকার। এইভাবে সনাতন কূটনীতি, গোপনীয়তা-ভিত্তিক ধ্রুপদী কূটনীতির (Classical diplomacy) অবক্ষয়ের অতলে তলিয়ে যাওয়ার সাথে সাথেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব ঘটল এক মুক্তদ্বার রাজনীতির অভিজ্ঞান হিসাবে। তাঁর চতুর্দশ শর্তের (Fourteen Points)

প্রারম্ভিক ঘোষণায় (Preamble) রাষ্ট্রপতি উইলসন আরও বললেন ঃ "রাজ্যবিজয় ও সম্প্রসারণের যুগ শেষ হয়ে গেছে। আর তার সাথে শেষ হয়ে গেছে; গোপন ইস্তাহারের দিন যে ইস্তাহার স্বাক্ষর করা হত নির্দিষ্ট কিছু সরকারের স্বার্থে, এমন ইস্তাহার যা কোন অভাবিত মুহূর্তে পৃথিবীর শান্তি বিনষ্ট করে নিতে পারত" ("The day of conquest and aggrandizement it gone by; so is also the day of secret covenants entered into in the interest of particular governments, and likely at some unlooked for moment to upset the peace of the World"—Woodrow Wilson)। স্পষ্টতই উড্রো উইলসন সেই প্রারম্ভিক ঘোষণা করছেন, আর সে যুগ, মর্গেনথোর মতে সনাতন কূটনীতির যুগ। এইভাবে সনাতন কূটনীতির অবসানের মুহূর্তে নয়া কূটনীতির (New Diplomacy) জন্ম হল। রাষ্ট্রপতি উইলসন সেই প্রারম্ভিক ঘোষণায় বললেন ঃ "এই হচ্ছে সেই আনন্দ সংবাদ যা এখন সমস্ত গণমানবের কাছে পরিষ্কার-যে মানবের চিন্তাধারা মৃত এবং অপগত যুগের প্রতি নিবদ্ধ নয় যে চিন্তাধারা বিচার ও বিশ্বশান্তির প্রতি উদ্দিষ্ট যে কোন জাতিকে এখন বা ভবিষ্যতের কোন সময় সেই প্রতিশ্রুতিতে নিবেদিত হতে শেখায়" ("It is this happy fact, now clear to the view of every public man whose thoughts do not still linger in an age that is dead and gone, which makes it possible for every nation whose purposes are consistent with justice and the peace of the world to avow, now or at any other time, the objects it has in view"—Woodrow Wilson)। কোন প্রতিশ্রুতির লক্ষ? তাও রাষ্ট্রপতি উইলসন নির্দিষ্ট করে দিলেন ঃ "শান্তির খোলা ইস্তাহার, মুক্ত পথে যাতে উপনীত হওয়া গেছে, যার পরে আর কোন একান্ত আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া থাকবে না, কিন্তু কূটনীতি পরিচালিত হবে খোলা মনে এবং গণদৃষ্টির সামনে" ("Open covenants of peace, openly arrived at, after which there shall be no private international understandings of any kind, but diplomacy shall proceed always frankly and in the public view"—Woodrow Wilson)।

মর্গেনথো রাষ্ট্রপতি উইলসনের এই মতটি উল্লেখ করে দেখাতে চেয়েছেন যে একটি অপস্রিয়মাণ যুগের কূটনীতির মৃত্যুদলিলে স্বাক্ষর করেছিলেন বর্তমান যুগের এই সার্থক রাষ্ট্রশাসক, আর বোঝাতে চেয়েছিলেন যে, যে খোলা কূটনীতির কথা আমরা বলি তা সনাতন কূটনীতির মৃত্যুকালীন এক নতুন উদ্ভাবনা যাকে তিনি বলেছেন "The modern version of that depreciation of diplomacy..." "কূটনীতির সেই অবক্ষয়ের আধুনিক রূপায়ণ"। মনে রাখতে হবে যে হার্টম্যান কখনো নয়া কূটনীতিকে সনাতন কূটনীতির ধ্বংসের ওপর গড়ে ওঠা মিনার হিসাবে দেখেননি। তাঁর মনে হয়েছিল রূপান্তরের ধারা বেয়ে সনাতন গড়িয়ে গেছে আধুনিকতায়, গোপন ইস্তাহারের যুগ ধারাবাহিকতা বজায় রেখেই বিলীন হল আধুনিকতার প্রতিশ্রুতিময় মুক্তির বেলাভূমিতে। সেখানেও তাঁর সন্দেহ ছিল। মুক্তির যে প্রতিশ্রুতি খোলা কূটনীতির মধ্যে আরোপ করা হচ্ছে তা পরিণতিতে একটি পরিপূর্ণতা অর্জন করতে পেরেছিল বলে তার মনে হয়নি। মর্গেনথো (Morgenthau) মনে করেন যে পুরানো কূটনীতির মধ্যে যে গোপনীয়তা ছিল তার অন্তর্নিহিত ভাবই ছিল মিথ্যাচার। তিনি লিখেছেন যে বিখ্যাত ব্রিটিশ রাষ্ট্রদূত স্যার হেনরি ওটন (Sir Henry Wotton) সম্বন্ধে এই ধারণা পোষণ করা হত যে তিনি ছিলেন "একজন সৎ ব্যক্তি যাঁকে দেশের কারণে মিথ্যা কথা বলার জন্য বিদেশে পাঠানো হয়েছিল" ("an honest man sent abroad to lie for his country")। ভিয়েনা কংগ্রেসের সময়ে যখন মেটারনিখকে (Metternich) সংবাদ দেওয়া হল যে রুশ রাষ্ট্রদূত প্রয়াত হয়েছেন তখন তিনি সবিস্ময়ে প্রশ্ন করেছিলেন ঃ "আঃ, তা কি সত্যি? তাঁর [অর্থাৎ সেই রাষ্ট্রদূতের] উদ্দেশ্য কি হতে পারে?" ("Ah, is that ture? What may have been his motive?")। কূটনীতির গোপনীয়তা ও চক্রান্ত প্রবণতা এমনি ছিল যে কোন কূটনীতিবিদের মৃত্যুর পরও প্রশ্ন ওঠে যে আলোচনা চলাকালীন তাঁর অকালমৃত্যুর পেছনে উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে।

এইরকম চক্রান্ত আর সন্দেহে ঠাসা গোপনীয়তার যুগ শেষ হল বিশ্বযুদ্ধের সময়ে। মর্গেনথো লিখলেন যে প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের সময়ে এবং পরে এই মতকে বিশেষভাবে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল যে কূটনীতিবিদদের গোপন

ষড়যন্ত্র, বৃহৎ অংশের জন্য না হলেও, অনেকখানি সেই যুদ্ধের জন্য দায়ী ("During and after the First World War, wide currency was given to the opinion that the secret machinations of diplomats shared a great deal, if not the major portion, of responsibility for that war ..." —Morgenthau)। শুধু তাই নয় কূটনৈতিক আদান-প্রদানের গোপনীয়তার মধ্যে রয়েছে —মর্গেনথো বিশ্বাস করেন—অভিজাততান্ত্রিক অতীতের পূর্বপুরুষীয় ও বিপজ্জনক তলানি ("... that the secrecy of diplomatic negotiations was an atavistic and dangerous residue from the aristocratic past..."—Morgenthau)। এর সঙ্গে এই ধারণাও চালু হয়েছিল যে, যে আন্তর্জাতিক বোঝাপড়া শান্তিপ্রিয় গণমতের সতর্ক চোখের সামনে দিয়ে পরিচালিত ও পরিণতিপ্রাপ্ত তা শান্তির স্বার্থকে বৃদ্ধি না করে পারে না।" ("... that international negotiations carried on and concluded under the watchful eyes of a peace loving public opinion could not but further the cause of peace"—Morgenthau)

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, যে নয়া কূটনীতি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময়ে ও পরে চালু হয়েছিল তা শান্তির স্বার্থকে চরিতার্থ করার জন্য প্রচলিত হয়েছিল, তার উদযাপন হয়েছিল নবযুগের উদ্বোধিত গণমতের সতর্ক প্রহরায় এবং শেষ পর্যন্ত তা মৃত্যুঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিল সেই কূটনৈতিক অতীতের যার মধ্যে অভিজাততান্ত্রিক গোপনীয়তার পূর্বপুরুষীয় (atavistic) ধারা বহমান ছিল। অভিজাততান্ত্রিক গোপনীয়তার খোলসের বাইরে আসার পরেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব হয় যে কূটনীতির পশ্চাৎপ্রেক্ষায় একটি শক্তিশালী জনমতের আবির্ভাবকে লক্ষ্য করা যায়। রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যে অভিজাততান্ত্রিক আদানপ্রদানের সঙ্গোপন প্রয়াস সনাতন কূটনীতির ব্যবহারিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাকে সম্পূর্ণ বাতিল করে দিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ, আর ডাক দিল এক মুক্ত দুনিয়ার যেখানে শান্তির ললিত সাধনা প্রতিষ্ঠিত হল খোলা কূটনীতির অবারিক অঙ্গনে। মর্গেনথো (Morgenthau) এই সমস্ত ব্যাপারটিকেই কূটনীতির সার্বিক অবক্ষয়ের এক অবিভাজ্য ধারা বলে মনে করেন। নয়া কূটনীতিকে, অর্থাৎ গোপন কূটনীতির স্থলে খোলা (Open) কূটনীতিকে, তিনি কূটনীতির উন্নততর রূপান্তর বলে মনে করেননি।

৩.৩.৭ নয়া কূটনীতি কি বিদ্রোহ?

হ্যারোল্ড নিকোলসনের (Harold Nicolson) গবেষণা থেকে আমরা আগেই জানতে পেরেছি যে গোপনীয়তা ভিত্তিক কূটনীতি আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দান, অর্থাৎ তা ঘনীভূত হয়েছিল জাতীয় রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের পর থেকে। জাতীয় রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ক্ষমতা লিপ্সা, বড় হওয়ার জন্য উচ্চাকাঙ্ক্ষা, বাজার ও উপনিবেশের জন্য লড়াই, স্থির সৈন্যবাহিনী (Standing army) মোতায়েন, আড়াল করা সম্পর্ক, গোপন আঁতাত, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অনৈতিক চুক্তি ইত্যাদির কারণে গুপ্ত আলোচনা, গোপন কূটনীতি ইত্যাদি দরকারা হত। যখন বিশ্বযুদ্ধে এ ধরনের কূটনীতির বীভৎস পরিণতি দেখে তাকে বর্জনের প্রশ্ন উঠল তখন শেষ পর্যন্ত তা হয়ে দাঁড়াল আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। মর্গেনথো (Morganthau) বলেছেন "কূটনীতির বিরুদ্ধাচরণ এবং তার অবক্ষয় তাহলে আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থা এবং যে ধরনের আন্তর্জাতিক রাজনীতির জন্ম সে দিয়েছিল তার বিরুদ্ধে এক বৈরিতার একটি বিশেষ প্রকাশমাত্র" ("The opposition to and depreciation of diplomacy is then but a peculiar manifestation of hostility to the modern state system and the kind of international politics it has produced"—Morgenthau)। আসলে নয়া কূটনীতি অতীতের অভিজাততান্ত্রিক কূটনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এক বৈরিতাকে বহন করত বলেই এর মধ্যে একটা বিদ্রোহের ভাব রয়েছে। বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে বড় ঘটনা হল গণমতের উত্থান যা গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার দান। এই গণমতই সনাতন কূটনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে সরব হয়েছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এই প্রতিবাদের ফলেই নয়া কূটনীতির আবির্ভাব বলে অনেকে এই নয়া কূটনীতিকে "গণতান্ত্রিক

কূটনীতি” (Democratic Diplomacy) বলে অভিহিত করেছেন। বিখ্যাত দুই রাষ্ট্রবিজ্ঞানী নর্ম্যান ডি. পামার এবং হাওয়ার্ড সি. পারকিনস তাদের ইন্টারনশনাল রিলেশন্স্ ঃ দ্য ওর্য়াল্ড কমিউনিটি ইন ট্রান্‌জিশন (Norman D. Palmer and Howard C. Perkins : International Relations : The World Community in Transition) গ্রন্থে লিখেছেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে ‘গণতান্ত্রিক কূটনীতি’ নামক শব্দটি সাধারণ ব্যবহারের মধ্যে চলে আসে। এটি বিশ্বব্যাপারে একটি নতুন ব্যবস্থার ইঙ্গিতবাহী ছিল—এমন একটি ব্যবস্থা যেখানে বিভিন্ন সরকার দ্রুত তাদের অভিজাততান্ত্রিক ঝোঁক এবং বিচ্ছিন্নতাকে হারাচ্ছিল, যে ব্যবস্থায় এক দেশের জনগণ কথা বলছিল আরেক দেশের জনগণের সাথে আর তা বলছিল গণতান্ত্রিক প্রতিনিধি ও বেসরকারি মাধ্যমে ("By the early twentieth century the term 'democratic diplomacy' had come into common use. It seemed to symbolize a new order in world affairs-one in which governments were fast losing their aristocratic leanings and this aloofness, and peoples were speaking to peoples through democratic representatives and informal channels"—Palmer and Perkins) এখন কথা হল, গোপন কূটনীতির (Secret Diplomacy) কূটনীতির (Secret Diplomacy) বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়ে যে ‘গণতান্ত্রিক কূটনীতি’র আবির্ভাব হয়েছিল তা নয়া কূটনীতির ভাবকে প্রকাশ করলেও তা কি সার্থক হয়েছিল? পামার ও পার্কিনস-এর মতে তা হয়নি। আর এই না হওয়াটা হয়ত নয়া কূটনীতির ব্যর্থতা। এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদ্বয় বলেছেন যে বস্তুতপক্ষে বিংশ শতাব্দীর আশার পরিবেশে এই নয়া ব্যবস্থার সূচনা হলেও তা পুরানো ব্যবস্থার থেকে খুব তফাৎ ছিল না। ("Actually, the new order was not so different from the old as if seemed in the atmosphere of hope that ushered in the present century"—Palmer and Perkins.)। তঁরা স্পষ্ট করেই বলেছেন যে “মোটের উপর ‘গণতান্ত্রিক কূটনীতি’ নিয়ে অভিজ্ঞতা হতাশাব্যঞ্জক” ("On the whole experience in 'democratic diplomacy' has been disappointing"—Palmer and Perkins.)। নয়া কূটনীতি জনগণতান্ত্রিক হওয়ার ফলে প্রায় সকলের আলোচনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে, তার সম্ভ্রম কমে গেছে আর সারা দেশের মানুষ কূটনৈতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করার ফলে কূটনীতির অন্তর্নিহিত গভীরতা ও গাম্ভীর্য হারিয়ে গেছে। পামার এবং পারকিনস বলেছেন যে প্রায়ই এই কূটনীতি বাজারের কূটনীতির সাথে জড়িয়ে পড়েছে, এমনকি তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণের কূটনীতি—অর্থাৎ এমন সব পরিবেশ তৈরী হয়েছে যেখানে রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ ও সূক্ষ্ম আলোচনা সম্ভব হচ্ছে না ("To often it has been associated with the diplomacy of the marketplace, or even plebiscitary diplomacy-that is, with conditions under which important and delicate negotiations between states cannot possibly be conducted with success"—Palmer & Perkins)। হ্যারল্ড নিকোলসন তাঁর Diplomacy গ্রন্থে গণতান্ত্রিক কূটনীতি নামে নয়া কূটনীতির ব্যর্থতায় তিন ধরনের কারণ উল্লেখ করেছেন—এক, ‘সার্বভৌম জনগণের দায়িত্বহীনতা’ ("the irresponsibility of the sovereign people")—অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সার্বভৌমতার অধিকারী জনগণ কূটনীতি নিয়ে অসার্থক আলোচনা করে যাতে কূটনীতির ধার কমে যায়, দুই, জনগণের অজ্ঞতা—যে অজ্ঞতার কারণ তথ্যের অভাব নয় কারণ মিডিয়া (media) বা গণমাধ্যমগুলির ভেতর দিয়ে প্রচারিত তথ্যের অভাব নেই, তবুও অজ্ঞতার কারণ দেশের গার্হস্থ্য বিষয়ে জনগণ যে ধ্যান দেয় পররাষ্ট্রনীতি ও কূটনীতির বিষয়ে সে ধ্যান তারা দেয় না, তিন, জনগণের বিশেষ ধরনের বোধ ও বিশ্বাস প্রসূত জ্ঞান যার থেকে জনগণ কোন বিষয়ে অবধা জেনে বা না জেনে মন্তব্য করে, আলাপ-আলোচনা, লেখালেখি শুরু করে দেয়। দায়িত্বপূর্ণ রাষ্ট্রশাসকরা (responsible statesmen) নীরব হয়ে যান। আধুনিক কূটনীতি অত্যন্ত বেশি খোলাখুলি হওয়ার ফলে পণ্ডিতম্মন্য মানুষের ভিড় বেড়ে গেছে। কূটনীতি নিরন্তর সমালোচনার মুখে পড়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে পড়ছে। এই সব পণ্ডিতম্মন্য মানুষদের নিকোলসন "Crackerbarrel philosophers" বলেছেন। জনগণতান্ত্রিকতার জোয়ারে এদের হাতেই নয়া কূটনীতি তার মর্যাদা হারাচ্ছে বলে তিনি মনে করেন।

৩.৩.৮ পুরানো কূটনীতি বনাম নয়া কূটনীতি ঃ বৈশিষ্ট্য ভিত্তিক পর্যালোচনা

হ্যারল্ড নিকোলসন (Harold Nicolson) পুরানো কূটনীতির পাঁচটি বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন। এক, এই কূটনীতিতে মনে করা হত যে ইউরোপ হচ্ছে সমস্ত মহাদেশগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং প্রধান; দুই এতে মনে করা হত যে বৃহৎ শক্তিগুলি ক্ষুদ্রশক্তিগুলি থেকে বৃহত্তর—the Great Powers are greater than small powers; তিন, এই রকম একটি বোধ পাশ্চাত্য কূটনীতিতে সংক্রামিত হয়েছিল যে ক্ষুদ্র শক্তিগুলিকে পরিচালিত করা বৃহৎ শক্তিগুলির সাধারণ বা সম্মিলিত দায়িত্ব (common responsibility); চার ইউরোপের প্রত্যেক দেশে একই ধাঁচে কূটনৈতিক পরিষেবা (diplomatic service on a more or less identical model) গঠন; পাঁচ, এই নিয়ম (rule) যে সমস্ত আলোচনা হতে হবে নিরবচ্ছিন্ন ও গোপন। এই সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলি প্রায় স্থায়ী হয়ে গিয়েছিল। তবুও নয়া কূটনীতির আমদানি করতে হল। এর প্রেক্ষাপটে তিনটি জিনিষ প্রধান—এক, উপনিবেশিক বিস্তারের ইচ্ছা ও তার জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা যা ইউরোপের প্রায় সব দেশের পররাষ্ট্রনীতির উপর প্রভাব ফেলেছিল ; দুই, উদগ্র বাণিজ্যিক প্রতিযোগিতা যার ফল হিসাবে যুক্ত হয়েছিল বাজার অধিকার করার উৎকট বাসনা, তিন, যোগাযোগ ব্যবস্থার আশাতীত উন্নতি ও গতিবৃদ্ধি। এর সমস্ত কিছুর সাথে জড়িত ছিল অন্তরালের ক্রমবর্ধমান ভিন্ন একটি শক্তি—শিল্প বিপ্লব। এই সমস্ত কিছুর ফলে পুরানো কূটনীতি বদলিয়ে নতুন কূটনীতির আবির্ভাব ঘটছিল। হ্যারল্ড নিকোলসন বলেছেন যে এই পরিবর্তনের সূচনা হয়েছিল ১৯১৯ সালের প্রায় একশত বছর আগে। তাহলে দেখা যাচ্ছে যে রাষ্ট্রপতি উইলসনের সাম্যবাদ (egalitarianism) এবং লয়েড জর্জের বৈঠকের মধ্য দিয়ে কূটনীতির ধারণাই (Diplomacy by Conference) নয়া কূটনীতির জন্য একমাত্র দায়ী ঘটনা নয়। একটা বিরাট ঐতিহাসিক ধারা অনেক দিন ধরেই কাজ করছিল। নয়া কূটনীতি এই ধারা জনিত পরিবর্তনের ফল। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে ঐতিহাসিক ধারার মধ্য থেকে উঠে আসলেও নয়া কূটনীতির মধ্যে একটি নতুন প্রবণতা দেখা যাচ্ছে যা সুষ্ঠু কূটনীতির গঠনের ক্ষেত্রে আশঙ্কার কারণ হয়েছে। রাষ্ট্রপতি উইলসনের সাম্যবাদের (egalitarianism) ফলেই হোক বা অন্য যে কোন প্রক্রিয়াজনিতই হোক আজকের পৃথিবীতে এই সত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে বড় বা ছোট সমস্ত দেশই সমান। হ্যারল্ড নিকোলসন বলেছেন যে যেমন সমস্ত মানুষ সমান সেইরকম সমস্ত রাষ্ট্র সমান একটি প্রবণতার জন্ম দিয়েছে, আর তা হল 'লবি' বা দল গঠনের প্রবণতা। আর এই লবিগুলির উদ্দেশ্য হল বৃহৎ শক্তিগুলির যে কোন প্রস্তাব তা যদি যুক্তিসঙ্গতও হয় তার বিরোধিতা করা ("The theory that all states are equal, even as all men are equal, had led to lobbies being formed among the smaller countries ... the sole unifying principle of which is to offer opposition even to the reasonable suggestions of the Great Powers"—Harold Nicolson)।

৩.৩.৯. নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা

১৯৭২ সালে মস্কো থেকে প্রকাশিত মডার্ন ডিপ্লোমেসি ঃ প্রিন্সিপালস, ডকুমেন্টস, পিওপেল গ্রন্থে কে. এ্যানাটোলিয়েভ (K. Anatoliev, Modern Diplomac : Principles, Documents, People) নয়া কূটনীতির সমালোচনা করেছেন। তিনি বলেছেন যে পররাষ্ট্রনীতি নিয়ে যাঁরা লিখেছেন তাঁরা প্রায়ই পুরানো কূটনীতি ও নয়া কূটনীতি শব্দগুলি ব্যবহার করে থাকেন। একথা ঠিক যে [বিংশ শতাব্দীর] বিগত পঞ্চাশ বছরে কূটনীতির প্রকরণ ও হাতিয়ারের মধ্যে অনেক পরিবর্তন এসেছে যা তালেরাঁ (Talleyrand) এবং বিসমার্কের (Bismarck) কূটনীতির এবং আমাদের কূটনীতির মধ্যে একটা সরল বিচ্ছেদ রেখা টেনে দিয়েছে। কিন্তু সে সংজ্ঞার ওপর এই বিভাজন টানা হয়েছে তা বৈজ্ঞানিকভাবে সঠিক নয়। কারণ তা বিষয়ের অন্তর্নিহিত বৈশিষ্ট্যকে মুছে দিয়েছে। আর তা হল কূটনীতির সামজিক

চরিত্র ("the social nature of diplomacy")। কে. এ্যানাটেলিয়েভ (K. Anatoliev) বলেছেন যে নয়া কূটনীতির মধ্যে একটা রাজনৈতিক বলা আছে যা হ্যারল্ড নিকোলসনের দ্য এভোলিউশন অভ ডিপ্লোমেটিক মেথড (Harold Nicolson : The Evolution of Diplomatic Method) গ্রন্থে স্পষ্ট হয়েছে। ["Writers on forign policy frequently use the terms Old Diplomcy and New Diplomacy. It is, of course, all too true that in the last half century or so there have been changes in the methods anddevices of diplomacy of Talleyrand and Bismarck and the diplomcy of our time. Those definitions cannot, however, claim to be scientifically accurate since they obliterate the substance of the matter : the social nature of diplomacy. Nonetheless the polemical barbs levelled against the New Diplomacy have a very obvious target. This point is easily proved on the example of Harold Nicolson's The Evolution of Diplomatic Method"—K. Anatoliev]

নিকোলসন নয়া কূটনীতির জনক হিসাবে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে (Woodrow W ilson) চিহ্নিত করেছেন এবং বলেছেন যে ভার্সাই সম্মেলনের সময় (১৯১৯) তিনি যে খোলা কূটনীতির কথা বলেছেন তা হল মার্কিন পদ্ধতি ("The American Method") যাকে পুরানো কূটনীতির গ্রীক, ইটালীয় ও ফরাসী পদ্ধতির থেকে আলাদা করা যায়। এইখানেই কে. এ্যানাটোলিয়েভের আপত্তি। তিনি বলেছেন যে এটি বিস্ময়কর যে তিনি খোলা কূটনীতির (Open diplomacy) প্রথম সম্ভাষণ খুঁজে পেয়েছিলেন রাষ্ট্রপতি উইলসনের চতুর্দশ শর্তের সেই শর্তে যেখানে তিনি বলেছেন যে কূটনীতি অগ্রসর হবে প্রকাশ্যে ও জনগণের দৃষ্টির সামনে — 'diplomacy should proceed always and frankly and in the public view'। নিকোলসনের দৃষ্টি পড়েনি সোভিয়েট সরকারের প্রথম পররাষ্ট্রনীতি দলিলে, তাদের 'শান্তির ঘোষণায়' (Decree on Peace)। এইটিই ছিল প্রকৃতপক্ষে সেই দলিল যা ইতিহাসে সর্বপ্রথম "সমস্ত জনগণের সামনে এবং প্রকাশ্যে আলাপ আলোচনা চালানো একটি দৃঢ় ইচ্ছা" প্রকাশ করেছিল ("It may seem a bit strange that Harold Nicolson should refer to president W ilson's Fourteen Points instead of addressing himself to the first foreign policy act of the Soviet Government, the Decree on Peace. It was precisely that document which expressed for the first time in History, 'a firm intention to conduct all negotiations quite openly and before the entire people'—K. Anatoliev)। আর সেই ইচ্ছাকে তৎক্ষণাৎ বাস্তবায়িত করেছিল নয়া কূটনীতির পদ্ধতিকে কার্যকরী করে। এইভাবেই কার্যকরী করার পথেই তারা জার সরকারের (Tsarist Government) সমস্ত গোপন সন্ধি ও চুক্তি প্রকাশ করে দিয়েছিল এবং অস্থায়ী বিপ্লবী সরকারের (The Provisional Governments) গোপন কূটনৈতিক কাগজপত্রও জনসমক্ষে এনে দিয়েছিল। এ্যানাটোলিয়েভ বলেছেন যে ১৯১৭ সালের ২২ নভেম্বর সোভিয়েট পররাষ্ট্র বিষয়ক জনগণের কমিসারিয়েট (Peoples Commissariat for Foreign Af fairs) যে ঘোষণা করেছিল তাই হল খোলা কূটনীতির প্রথম মুক্ত ঘোষণা, নয়া কূটনীতির নতুন ইস্তাহার। এই ইস্তাহারে বলা হয়েছিল যে "গোপন কূটনীতির নিষিদ্ধ হওয়া হল জনমুখী ও প্রকৃত গণতান্ত্রিক পররাষ্ট্রনীতির অন্তর্নিহিত সততার প্রথম বনিয়াদী শর্ত। বাস্তব ক্ষেত্রে এই নীতির অনুসরণ করাকে সোভিয়েট সরকার তার পালনীয় কাজ বলে মেনে নিয়েছে ("The abolition of secret diplomacy is a primary conditions of honesty in a popular and truly democratic foreign policy. To pursue that policy in practice is the task the Soviet Government sets itself.")।

এ্যানাটোলিয়েভ বলেছেন যে হ্যারল্ড নিকোলসন নয়া কূটনীতির সমর্থক নন। অতএব এই মার্কিন কূটনীতির জনক হিসাবে উড্রো উইলসনকে চিহ্নিত করে তিনি প্রকৃতপক্ষে তাঁকে সামনে খাড়া রেখে পেছনে সোভিয়েত মুক্ত কূটনীতি, খোলা দেওয়া-নেওয়ার সমালোচনা করেছেন। নয়া কূটনীতি বুর্জোয়া রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের কাছে যথেষ্ট সমাদর পায়নি এবং এই রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের পুরোধা হিসাবে হ্যারল্ড নিকোলসনও তাকে সমাদর করতে পারেননি। তিনি তাঁর আক্রমণের আপাত বিষয় করেছিলেন রাষ্ট্রপতি উইলসনের নীতিকে এবং উহ্য রেখেছিলেন মুক্ত দুনিয়ার অঙ্গীকার সোভিয়েত শান্তি ইস্তাহারকে। যেহেতু এই ইস্তাহারই একটি প্রাথমিক দলিল তা ধরে নিতে হবে নিকোলসনের

প্রত্যক্ষভাবে নয়া মার্কিন কূটনীতিকে এবং পরোক্ষভাবে অলঙ্ঘ্য সোভিয়েট মুক্ত দুনিয়ার ঘোষণাপত্রকে তিরস্কার করেছেন।

৩.৩.১০ সারাংশ

সভ্যতা তার অগ্রগতির ইতিহাসে পাঁচরকম কূটনীতির জন্ম দিয়েছে—তা হল গ্রীক, রোমান, ফরাসী, ইটালীয় ও মার্কিন কূটনীতি। এর মধ্যে মার্কিন কূটনীতি একটু ভিন্ন ধরনের। আগের কূটনীতি হল পুরানো কূটনীতি যার মূল বিষয় ছিল গোপনীয়তা—জনগণের কাছ থেকে আন্তর্জাতিক দেওয়া-নেওয়া যাবতীয় তথ্যকে লুকিয়ে রাখা। এটি হল অভিজাততান্ত্রিক কূটনীতি। এই কূটনীতির ফলেই ঘটে গিয়েছিল প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। এই যুদ্ধের বীভৎসতা দেখে মানুষ এই কূটনীতি থেকে সরে এল। আত্মপ্রকাশ করল নয়া কূটনীতি জনগণতান্ত্রিক কূটনীতি। ১৯১৮ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন তাঁর চৌদ্দ দফা শর্তের মধ্যে খোলা (open) কূটনীতির প্রতিশ্রুতিকে ঘোষণা করলেন। এর আগেই ১৯১৭ সালে রুশ বিপ্লবের পর সোভিয়েট সরকার তাদের শান্তির ইস্তাহারে এই ঘোষণাটিই করেছিলেন। অর্থাৎ যুদ্ধের পরে ভয়মুক্ত শান্তির ললিত আশ্বাসকে ছড়িয়ে দেওয়া হল নয়া কূটনীতির কাঠামো খোলা দেওয়া-নেওয়ার প্রতিশ্রুতির মধ্যে। এক সময়ে পৃথিবীতে জাতীয় রাষ্ট্র উদ্ভবের পর পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও হানাহানি থেকে সনাতন কূটনীতির গোপনীয়তার ভাবটি এসেছিল এখন এই খোলা কূটনীতির ধারণা হয়ে দাঁড়াল পুরাতন জাতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ। এই যে পুরাতন থেকে নয়া কূটনীতির পরিবর্তন তা একদিনে হয়নি। ১৯১৯ সালে ভার্সাই চুক্তির প্রায় একশত বছর আগে থেকে ইউরোপে যে সমস্ত রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিবর্তন সাধিত হচ্ছিল তারই মধ্যে লুকিয়েছিল এই রূপান্তরের বীজ। ১৯১৭ সালে সোভিয়েট সরকার বা ১৯১৮ সালে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসন শুধু এই রূপান্তরের পরিণতি পর্বের মেরুবিন্দুকে তাঁদের চিন্তাধারার মধ্যে প্রকাশ করেছিলেন। মনে রাখতে হবে যে নয়া কূটনীতির প্রত্যক্ষ পদ্ধতির সঙ্গে জড়িয়ে থাকেন কূটনীতিবিদরা, আড়ালে থাকে সার্বভৌম জনগণ। তাদের জনমত কূটনীতির ধারাকে প্রভাবিত করে। এই জনগণের অজ্ঞতা ও বাড়াবাড়ি, তাদের মোহ এবং উচ্ছ্বাস যা গণমাধ্যমগুলির মধ্যে প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তা অনেক সময়ে কূটনীতির সাবলীল গতি রুদ্ধ করে। তার ফলে আধুনিক কূটনীতি বা নয়া কূটনীতি যা খোলামেলা হতে গিয়ে অনেক সময়ে অত্যন্ত বেশী খোলামেলা হয়ে পড়ে তা পরিণতিতে সার্থকভাবে কার্যকর হয় না। কূটনীতির ব্যর্থতা এইখানে।

৩.৩.১১ প্রশ্নাবলী

১. দশটি বাক্যে উত্তর দিন।

ক) সনাতন কূটনীতির পর্বগুলি সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

খ) নয়া কূটনীতি কাকে বলে ব্যাখ্যা করুন।

গ) সনাতন কূটনীতির দুর্বলতা কি?

ঘ) নয়া কূটনীতির দুর্বলতা কি?

ঙ) নয়া কূটনীতির আবির্ভাবের পেছনে সোভিয়েত রাশিয়ার অবদান কি?

চ) কূটনীতির ইতিহাসে রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনের গুরুত্ব বর্ণনা করুন।

ছ) নয়া কূটনীতি কি সার্থক?

জ) সনাতন কূটনীতির কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

ঝ) আধুনিক কূটনীতি সম্বন্ধে মার্ক্সীয় মতটি কি?

ঞ) গণতান্ত্রিক কূটনীতি কি?

২. পাঁচটি বাক্যে উত্তর দিন

ক) আমরা কূটনীতির ইতিহাস পড়ব কেন?

খ) কূটনীতিক বিবর্তনে জাতীয় রাষ্ট্রের ভূমিকা কি?

গ) কূটনীতির ইতিহাসে একজন গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তির মত আলোচনা করুন।

ঘ) কূটনীতির ইতিহাসে কার্ডিনাল রিশলে গুরুত্বপূর্ণ কেন?

ঙ) নয়া কূটনীতির আবির্ভাবের কারণ কি?

চ) গোপন কূটনীতির বিপরীত কূটনীতি কি? তা বিখ্যাত কেন?

ছ) আধুনিক কূটনীতিতে সার্বভৌম জনগণের ভূমিকা কি?

জ) নয়া কূটনীতির ত্রুটি হার্টম্যান (Hartmann) কিভাবে ব্যাখ্যা করেছেন?

ঝ) নয়া কূটনীতি নিয়ে হার্টম্যান ও মরগেনথোর (Morgenthau) মধ্যে চিন্তাধারার কি কোন বিরোধ আছে?

ঞ) 'কূটনীতির পতন' কি?

৩. পনেরোটি বাক্যে উত্তর দিন।

ক) খোলা কূটনীতি (Open Diplomacy) ও গোপন কূটনীতির (Secret Diplomacy) বৈসাদৃশ্য আলোচন করুন।

খ) নয়া কূটনীতির মার্ক্সবাদী সমালোচনা বলতে কি বোঝায়?

গ) রাষ্ট্রপতি উড্রো উইলসনকে কি নয়া কূটনীতির জনক বলা যায়?

ঘ) চৌদ্দ দফা শর্তের কোন শর্তকে বা কোন্ কোন্ শর্তকে নয়া কূটনীতির প্রারম্ভিক সূচনা বলা যেতে পারে এবং কেন তা গ্রাহ্য বলে মনে হয়?

ঙ) পুরানো কূটনীতির বৈশিষ্ট্যভিত্তিক পর্যালোচনা করুন।

চ) হ্যারল্ড নিকোলসন (Harold Nicolson) এর মতবাদ সম্বন্ধে মার্ক্সবাদী পর্যালোচনা কি?

ছ) উনিশ শতকের কূটনীতিতে গোপনীয়তার অভ্যুদয় কিভাবে হয়েছিল?

জ) নয়া কূটনীতি কতটা নতুন?

ঝ) গোপন কূটনীতির অভ্যুদয়ে বিসমার্কের অবদান কি?

ঞ) নয়া কূটনীতি কি সার্থক কূটনীতি?

৩.৩.১২ গ্রন্থপঞ্জী

১. Harold Nicolson, The Evolution of Diplomatic Method.

২. Harold Nicolson, Diplomacy.

৩. K. Anatoliev, Modern Diplomacy : Principles, Documents, People.
৪. Machiavelli, The Prince.
৫. D. M. Ketelbey, A History of Modern Times.
৬. David Thompson, Europe since Nepoleon.
৭. E. Lipson, Europe in the 19th & 20th Centuries.
৮. Frederick H. Hartmann, The Relations of Nations.
৯. Hans J. Morgenthau, Politics Among Nations : The Struggle for Power and Peace.
১০. Norman D. Palmer and Howart C. Perkins, International Relations : The World Community in Transition.
১১. Rene 'Albrecht Curric', Diplomacy History of Europe.